International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-I, January 2026, Page No. 35-42
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.01W.178

লোকসংস্কৃতি বনাম ভদ্রলোক সংস্কৃতি: উনিশ শতকের বাংলায় এক দ্বন্দ্বমূলক পাঠ

দীপক ঘোষ
স্বাধীন গবেষক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 15.01.2026; Accepted: 26.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Nineteenth-century Bengal was a complex phase of social, cultural, and intellectual transformation under colonial rule. During this period, the spread of Western education, the English language, print technology, and urbanization led to the emergence of a new English-educated middle class, historically known as bhadralok society. This bhadralok culture sought to establish itself as the bearer of modernity, rationality, moral reform, and social progress. In contrast, the long-established folk culture of rural Bengal – comprising folk songs, folk theatre, folk religion, rituals, and oral traditions – represented a different cultural logic and social reality.

This paper analyzes the relationship between folk culture and bhadralok culture in nineteenth-century Bengal as a "dialectical," "unequal power-laden," and "class-based cultural process." It demonstrates that bhadralok dominance was not limited to matters of taste, morality, or reform; rather, it functioned as a form of cultural power closely linked to education, language, knowledge production, and the colonial state. Through print culture, newspapers, and literary language, bhadralok society attempted to marginalize folk culture by labeling it as backward, primitive, and "inferior."

However, the paper also argues that folk culture was not entirely erased. Instead, through various processes of resistance, adaptation, and negotiation, folk culture sustained its presence within the space of modernity. Drawing on the theoretical frameworks of Subaltern Studies, cultural hegemony, and colonial modernity, this study seeks to reassess the cultural history of nineteenth-century Bengal from a new and critical perspective.

Keywords: Folk culture, bhadralok culture, nineteenth-century Bengal, cultural conflict, cultural hegemony, colonial modernity, class and culture

ভূমিকা:

উনিশ শতকের বাংলা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে এক গভীর রূপান্তরের কালপর্ব। এই সময়ে বাংলা সমাজ একযোগে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার, মুদ্রণযন্ত্রের প্রসার এবং নগরায়ণের দ্রুত অগ্রগতি বাংলার সমাজজীবনকে আমূল পরিবর্তিত করে। এই পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বাংলার সাংস্কৃতিক পরিসরে দুটি ভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী ধারার মুখোমুখি অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে— একদিকে ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতি, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার প্রভাবে গঠিত ভদ্রলোক সংস্কৃতি।

পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) এবং বক্সারের যুদ্ধের (১৭৬৪) পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক আধিপত্য বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজের কাঠামোগত রূপান্তর শুরু হয়। ১৭৯৩ সালের স্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার গ্রামীণ সমাজে ভূমিস্বত্ব, কৃষি উৎপাদন ও শ্রেণি সম্পর্ককে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে। এই অর্থনৈতিক

পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসন, আইন ও শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ঘটে, যা এক নতুন ধরনের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থানের পথ প্রশস্ত করে। এই শ্রেণিই পরবর্তীকালে 'ভদ্রলোক সমাজ' নামে পরিচিত হয়।

ভদ্রলোক সমাজ মূলত ইংরেজি শিক্ষিত, নগরকেন্দ্রিক এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিল। তারা পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা ও সামাজিক সংস্কারের আদর্শকে গ্রহণ করে নিজেদের আধুনিকতার প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরে। কিন্তু এই আধুনিকতার ধারণা ছিল নির্বাচিত ও শ্রেণিনির্ভর। ভদ্রলোক সংস্কৃতি নিজেকে 'উন্নত' ও 'শুদ্ধ' সংস্কৃতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বাংলার দীর্ঘকালীন লোকসংস্কৃতিকে প্রায়ই পশ্চাৎপদ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অশিক্ষিত বলে চিহ্নিত করে।

অন্যদিকে লোকসংস্কৃতি ছিল বাংলার গ্রামীণ সমাজের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা, ঋতুচক্র, নদী ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক লোকসংস্কৃতির ভিত গড়ে তোলে। লোকগান, লোকনাট্য, লোকধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান ও মৌখিক কাহিনির মাধ্যমে এই সংস্কৃতি প্রজন্মের পর প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। লোকসংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এর সামষ্টিক চরিত্র ও অংশগ্রহণমূলক রূপ, যেখানে নারী, নিম্নবর্গ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

উনিশ শতকে এই দুই সংস্কৃতির মুখোমুখি অবস্থান কেবল রুচি বা নান্দনিকতার প্রশ্নে সীমাবদ্ধ ছিল না। এটি ছিল মূলত ক্ষমতা, শ্রেণি ও জ্ঞান উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত একটি দ্বন্দ্ব। ভদ্রলোক সংস্কৃতি মুদ্রণযন্ত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক ক্ষমতার সাহায্যে নিজস্ব মূল্যবোধকে সমাজের 'মানদণ্ড' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। এর ফলে লোকসংস্কৃতি ধীরে ধীরে প্রান্তিক অবস্থানে চলে যায় এবং ইতিহাসচর্চা ও সাহিত্যিক আলোচনায় তার উপস্থিতি ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

এই প্রবন্ধের লক্ষ্য হল উনিশ শতকের বাংলায় লোকসংস্কৃতি ও ভদ্রলোক সংস্কৃতির এই দ্বন্দ্বকে ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা। এখানে যুক্তি দেওয়া হবে যে তথাকথিত 'বাংলা নবজাগরণ' কেবল আলোকপ্রাপ্তির ইতিহাস নয়; এর অন্তরালে রয়েছে লোকসংস্কৃতির অবমূল্যায়ন ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার একটি জটিল প্রক্রিয়া। এই প্রেক্ষাপটে লোকসংস্কৃতি ও ভদ্রলোক সংস্কৃতির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে উনিশ শতকের বাংলার আধুনিকতার ধারণাকে আরও সমালোচনামূলকভাবে বোঝা সম্ভব হয়।

1.লোকসংস্কৃতির ধারণা, উৎস ও সামাজিক ভিত্তি:

উনিশ শতকের বাংলায় লোকসংস্কৃতি ছিল সমাজজীবনের এক মৌলিক ভিত্তি, যা কেবল সাংস্কৃতিক প্রকাশ নয়, বরং সামাজিক সম্পর্ক, বিশ্বাসব্যবস্থা ও দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। লোকসংস্কৃতি মূলত সেই সংস্কৃতি, যা গ্রামীণ সমাজে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ—কৃষক, জেলে, কারিগর, শ্রমজীবী ও নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্মে মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়েছে। লিখিত জ্ঞান বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে থেকেও লোকসংস্কৃতি নিজস্ব জ্ঞানতন্ত্র ও সাংস্কৃতিক যুক্তি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর মৌখিকতা (oral tradition) । গান, গল্প, ছড়া, ব্রতকথা ও পালাগানের মাধ্যমে লোকজ জ্ঞান সমাজে বিস্তৃত হয়। এই মৌখিক ঐতিহ্য লোকসংস্কৃতিকে প্রাণবন্ত ও পরিবর্তনশীল করে তোলে। লিখিত সংস্কৃতির মতো স্থির নয়; বরং পরিবেশ, সময় ও সামাজিক প্রয়োজন অনুযায়ী লোকসংস্কৃতি নিজেকে বারবার নতুনভাবে রূপ দেয়। এই কারণেই উনিশ শতকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যেও লোকসংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি।

লোকসংস্কৃতির উৎস ও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা

বাংলার লোকসংস্কৃতির শিকড় প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে প্রোথিত। মধ্যযুগীয় বাংলার মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি ও লোকধর্মীয় আচার উনিশ শতকের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গলের মতো কাব্যধারা লোকধর্ম, কৃষিজ সমাজ ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে সাংস্কৃতিক ভাষা দিয়েছে। এই ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে যে লোকসংস্কৃতি কোনও বিচ্ছিন্ন বা 'অপরিণত' সংস্কৃতি নয়; বরং এর নিজস্ব ঐতিহাসিক গভীরতা রয়েছে।

উনিশ শতকে কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা, ঋতুচক্র, নদীনির্ভর জীবন ও প্রকৃতির অনিশ্চয়তা লোকসংস্কৃতির বিষয়বস্তুকে নির্ধারণ করে। বন্যা, খরা, রোগব্যাধি ও কৃষিজ সংকট লোকধর্ম ও লোকাচারের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অর্থ পায়। মনসা, শীতলা বা ধর্মঠাকুরের মতো লোকদেবতারা এই অনিশ্চিত জীবনের প্রতীক হয়ে ওঠে। ফলে লোকসংস্কৃতি কেবল বিশ্বাসের বিষয় নয়, বরং জীবনের বাস্তব সমস্যার সঙ্গে যুক্ত এক সামাজিক প্রতিক্রিয়া।

লোকগান ও লোকনাট্য: সামাজিক অভিজ্ঞতার ভাষা

উনিশ শতকের বাংলায় লোকসংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রূপ ছিল লোকগান ও লোকনাট্য। বাউল, ভাটিয়ালি, ঝুমুর, কীর্তন—এই গানগুলির মধ্যে মানুষের প্রেম, দুঃখ, শ্রম, আধ্যাত্মিকতা ও প্রতিবাদের সুর ধরা পড়ে। বিশেষ করে বাউল গান সামাজিক শ্রেণি, জাতপাত ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে এক ধরনের মানবতাবাদী দর্শন তুলে ধরে। এই গানগুলি ভদ্রলোক সমাজের যুক্তিবাদী ও সংস্কারবাদী ধর্মচিন্তার সঙ্গে এক ভিন্ন সাংস্কৃতিক যুক্তি তৈরি করে।

যাত্রা ও পালাগান লোকনাট্যের প্রধান মাধ্যম ছিল। যাত্রা কেবল বিনোদন নয়; এটি ছিল সামাজিক ভাষ্য ও সমালোচনার এক শক্তিশালী মাধ্যম। গ্রামীণ সমাজে যাত্রার মাধ্যমে নৈতিকতা, ধর্মীয় কাহিনি ও সামাজিক দ্বন্দ্ব মঞ্চস্থ হতো। উনিশ শতকে যাত্রা অনেক সময় ভদ্রলোক সমাজের কাছে 'অশ্লীল' বা 'অপরিশীলিত' বলে বিবেচিত হলেও গ্রামীণ সমাজে এর গ্রহণযোগ্যতা ছিল ব্যাপক।

লোকসংস্কৃতি ও সামাজিক অংশগ্রহণ

লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল এর অংশগ্রহণমূলক চরিত্র। ভদ্রলোক সংস্কৃতির মতো এটি কোনও নির্দিষ্ট শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। নারী, নিম্নবর্গ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ লোকসংস্কৃতিকে সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলেছিল। ব্রতকথা, লোকগান ও লোকআচার নারীদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে প্রকাশের সুযোগ দিয়েছে, যা ভদ্রলোক সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরে খুব কমই স্বীকৃতি পেয়েছে।

এই অংশগ্রহণমূলক চরিত্রই লোকসংস্কৃতিকে ভদ্রলোক সংস্কৃতির কাছে এক ধরনের 'হুমকি' হিসেবে তুলে ধরে। কারণ লোকসংস্কৃতি ভদ্রলোকদের নির্ধারিত রুচি, নৈতিকতা ও সাংস্কৃতিক মানদণ্ডকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়।

লোকসংস্কৃতি ও শ্রেণি বাস্তবতা

উনিশ শতকের বাংলায় লোকসংস্কৃতি মূলত কৃষক ও শ্রমজীবী শ্রেণির জীবনসংগ্রামের প্রতিফলন। নীল বিদ্রোহ বা কৃষক অসন্তোষের সময় লোকগান ও পালাগানের মাধ্যমে প্রতিবাদের ভাষা গড়ে ওঠে। যদিও এই প্রতিবাদ সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ নেয়নি, তবুও লোকসংস্কৃতি গ্রামীণ সমাজের ভেতরে এক ধরনের সচেতনতা ও সামাজিক সংহতি তৈরি করে।

এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, লোকসংস্কৃতি কেবল অতীতের ঐতিহ্য নয়; এটি উনিশ শতকের বাংলায় সামাজিক বাস্তবতার এক জীবন্ত দলিল। ভদ্রলোক সংস্কৃতির আধিপত্যের মুখে লোকসংস্কৃতি প্রান্তিক হয়ে পড়লেও, তার সামাজিক গুরুত্ব ও সাংস্কৃতিক শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়নি।

2. ভদ্রলোক সংস্কৃতির উত্থান: শিক্ষা, মুদ্রণ ও নগরায়ণের প্রেক্ষাপট:

উনিশ শতকের বাংলায় ভদ্রলোক সংস্কৃতির উত্থান ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ফলাফল। এই সংস্কৃতি কোনও স্বতঃস্ফূর্ত বা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠেনি; বরং ব্রিটিশ প্রশাসনিক কাঠামো, পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা, মুদ্রণসংস্কৃতি এবং নগরায়ণের সম্মিলিত প্রভাবের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে নির্মিত হয়েছে। ভদ্রলোক সংস্কৃতি মূলত সেই সামাজিক গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি, যারা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিল এবং নিজেদের আধুনিকতা ও সামাজিক নেতৃত্বের দাবিদার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভদ্রলোক শ্রেণির নির্মাণ:

ভদ্রলোক সংস্কৃতির বিকাশে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার ভূমিকা ছিল মৌলিক। আঠারো শতকের শেষ ভাগ থেকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, হিন্দু কলেজ এবং পরবর্তী সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ম্যাকলে মিনিট (১৮৩৫) ইংরেজি শিক্ষাকে সরকারি নীতির কেন্দ্রে নিয়ে আসে, যার ফলে একটি ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্রুত উত্থান ঘটে। এই শ্রেণি প্রশাসনিক চাকরি, আইন, সাংবাদিকতা ও শিক্ষকতার মাধ্যমে সামাজিক ক্ষমতা অর্জন করে।

এই শিক্ষাব্যবস্থা ভদ্রলোক সমাজকে যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা ও প্রগতিশীলতার ভাষা প্রদান করে। কিন্তু একই সঙ্গে এটি একটি সাংস্কৃতিক বিভাজনও তৈরি করে। ইংরেজি শিক্ষা লোকসংস্কৃতির মৌখিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক সংস্কৃতিকে 'অবৈজ্ঞানিক' বা 'অযৌক্তিক' হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা সৃষ্টি করে। ফলে শিক্ষা হয়ে ওঠে ভদ্রলোক আধিপত্যের একটি প্রধান হাতিয়ার।

মুদ্রণসংস্কৃতি ও জ্ঞান উৎপাদনের ক্ষমতা:

উনিশ শতকের বাংলায় মুদ্রণযন্ত্রের প্রসার ভদ্রলোক সংস্কৃতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, পাঠ্যপুস্তক ও সাহিত্যগ্রন্থ ভদ্রলোকদের হাতে জ্ঞান উৎপাদন ও প্রচারের শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষার মানকরণ, সাহিত্যিক ভাষার নির্মাণ এবং 'শুদ্ধ' সংস্কৃতির ধারণা মুদ্রণসংস্কৃতির মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে লোকসংস্কৃতিকে প্রায়ই কুসংস্কার, অশ্লীলতা বা পশ্চাৎপদতার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়। যাত্রা, কবিগান ও লোকধর্মের আচার ভদ্রলোক লেখকদের কলমে নিন্দিত হয়। এইভাবে মুদ্রণসংস্কৃতি ভদ্রলোক সংস্কৃতির রুচি ও নৈতিকতাকে সমাজের সার্বজনীন মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে, আর লোকসংস্কৃতিকে প্রান্তিক করে তোলে।

নগরায়ণ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে কলকাতা:

ভদ্রলোক সংস্কৃতির বিকাশে নগরায়ণ বিশেষত কলকাতার ভূমিকা ছিল কেন্দ্রীয়। কলকাতা ছিল ব্রিটিশ ভারতের প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র, যেখানে শিক্ষা, চাকরি ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। এই নগরকেন্দ্রিকতা ভদ্রলোক সংস্কৃতিকে একটি ভৌগোলিক সুবিধা প্রদান করে, যা গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির তুলনায় তাকে অধিক দৃশ্যমান ও প্রভাবশালী করে তোলে।

নগরজীবনের সঙ্গে যুক্ত ভদ্রলোক সংস্কৃতি পরিচ্ছন্নতা, শালীনতা ও নৈতিক শুদ্ধতার ধারণাকে গুরুত্ব দেয়। গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির খোলা, অংশগ্রহণমূলক ও দেহনির্ভর রূপকে নগরভিত্তিক ভদ্রলোক রুচি প্রায়ই 'অশোভন' বলে বিবেচনা করে। এই নগর–গ্রাম বিভাজন সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বকে আরও গভীর করে তোলে।

সামাজিক সংস্কার ও নৈতিক আধিপত্য:

ভদ্রলোক সংস্কৃতি সামাজিক সংস্কারের ভাষাকে ব্যবহার করে নিজেদের সাংস্কৃতিক নেতৃত্বকে ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করে। সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলন, বিধবা বিবাহ ও নারীশিক্ষার মতো উদ্যোগগুলি নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল ছিল। কিন্তু একই সঙ্গে এই সংস্কারমূলক প্রকল্পগুলির মাধ্যমে ভদ্রলোক সমাজ লোকসংস্কৃতির বহু আচার ও বিশ্বাসকে অবৈধ ও অবাঞ্ছিত বলে চিহ্নিত করে।

এই প্রক্রিয়ায় ভদ্রলোক সংস্কৃতি নৈতিকতার এক নতুন মানদণ্ড তৈরি করে, যা শ্রেণিনির্ভর এবং নির্বাচিত। গ্রামাঞ্চলের লোকাচার ও উৎসবকে 'অসভ্য' বা 'পশ্চাৎপদ' বলে আখ্যা দিয়ে সংস্কারমূলক আধুনিকতার নামে সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ভদ্রলোক সংস্কৃতি ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র:

ভদ্রলোক সংস্কৃতির উত্থান ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সমর্থন ছাড়া সম্ভব ছিল না। প্রশাসনিক চাকরি, আইন ও শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ভদ্রলোক সমাজ রাষ্ট্রের সঙ্গে এক ধরনের মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে তোলে। এর ফলে ভদ্রলোক সংস্কৃতি ঔপনিবেশিক আধুনিকতার ভাষাকে আত্মস্থ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে তার বাহক হয়ে ওঠে।

এই প্রেক্ষাপটে ভদ্রলোক সংস্কৃতি একদিকে ঔপনিবেশিক আধিপত্যের সমালোচক হলেও, অন্যদিকে লোকসংস্কৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারে ঔপনিবেশিক কাঠামোর সুবিধা গ্রহণ করে। এই দ্বৈত ভূমিকা উনিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে আরও জটিল করে তোলে।

3. লোকসংস্কৃতি বনাম ভদ্রলোক সংস্কৃতি: ভাষা, ধর্ম, নৈতিকতা ও শরীরচেতনার দ্বন্দ্ব:

উনিশ শতকের বাংলায় লোকসংস্কৃতি ও ভদ্রলোক সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে ভাষা, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিকতার ধারণা এবং শরীরচেতনার প্রশ্নে। এই ক্ষেত্রগুলিতে দ্বন্দ্ব কেবল মতাদর্শগত ছিল না; বরং তা ছিল শ্রেণি, ক্ষমতা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। ভদ্রলোক সংস্কৃতি নিজের সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এই ক্ষেত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

ভাষা ও সাহিত্য: রুচি ও ক্ষমতার প্রশ্নে

ভাষা ছিল ভদ্রলোক ও লোকসংস্কৃতির দ্বন্দ্বের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। উনিশ শতকের ভদ্রলোক সমাজ বাংলা ভাষার একটি 'শুদ্ধ', মান্য ও সাহিত্যিক রূপ নির্মাণে সচেষ্ট হয়। সংস্কৃতঘেঁষা শব্দভাণ্ডার, ব্যাকরণগত শুদ্ধতা ও লিখিত রীতিকে সাহিত্যিক মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় লোকভাষা, উপভাষা ও কথ্য ভাষাকে 'অশুদ্ধ' বা 'অপরিণত' বলে চিহ্নিত করা হয়।

লোকসংস্কৃতিতে ব্যবহৃত ভাষা ছিল জীবন্ত, স্থানীয় ও অভিজ্ঞতানির্ভর। পালাগান, লোককথা ও যাত্রায় ব্যবহৃত ভাষা সমাজের দৈনন্দিন বাস্তবতাকে ধারণ করত। কিন্তু ভদ্রলোক সাহিত্যিক পরিসরে এই ভাষা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ফলে ভাষার মানকরণ একটি নিরপেক্ষ সাহিত্যিক উদ্যোগ না হয়ে শ্রেণিনির্ভর সাংস্কৃতিক ক্ষমতার প্রকাশে পরিণত হয়।

ধর্ম ও বিশ্বাস: যুক্তিবাদ বনাম লোকধর্ম

ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও দ্বন্দ্ব তীব্র ছিল। লোকসংস্কৃতিতে বহুত্ববাদী লোকধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রাধান্য ছিল। মনসা, ধর্মঠাকুর, শীতলা প্রভৃতি লোকদেবতা গ্রামীণ সমাজের দৈনন্দিন সংকট ও আশঙ্কার সঙ্গে যুক্ত ছিল। রোগব্যাধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও কৃষিজ অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে এই লোকধর্ম মানুষকে মানসিক আশ্রয় দিত। ভদ্রলোক সংস্কারবাদীরা এই লোকধর্মকে কুসংস্কার বলে আখ্যা দেন। ব্রাহ্ম সমাজ ও অন্যান্য সংস্কারমূলক আন্দোলন যুক্তিবাদী ও একেশ্বরবাদী ধর্মচর্চাকে উৎসাহিত করে। এই ধর্মীয় সংস্কার প্রকল্প লোকধর্মকে প্রান্তিক করে তোলে এবং গ্রামীণ সমাজের ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে অবমূল্যায়ন করে।

নৈতিকতা ও সামাজিক শুদ্ধতার ধারণা

ভদ্রলোক সংস্কৃতির নৈতিকতার ধারণা ছিল মধ্যবিত্ত ও নগরকেন্দ্রিক। শালীনতা, সংযম ও সামাজিক শুদ্ধতাকে সাংস্কৃতিক মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর ফলে যাত্রা, কবিগান ও লোকনাট্যের মতো প্রকাশভঙ্গিকে প্রায়ই 'অশ্লীল' ও 'নৈতিকভাবে অবক্ষয়গ্রস্ত' বলা হয়।

লোকসংস্কৃতিতে দেহ, আবেগ ও সামষ্টিক অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উৎসব, নৃত্য ও গানে শরীরের প্রকাশ স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য ছিল। ভদ্রলোক নৈতিকতা এই দেহকেন্দ্রিক সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ ও সীমাবদ্ধ করতে চায়, যা আসলে সাংস্কৃতিক আধিপত্যের এক রূপ।

শরীরচেতনা ও লিঙ্গ রাজনীতি

শরীরচেতনার প্রশ্নে দ্বন্দ্ব আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লোকসংস্কৃতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। ব্রতকথা, লোকগান ও আচার-অনুষ্ঠানে নারীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ পেত। কিন্তু ভদ্রলোক সংস্কৃতির পরিসরে নারীকে গৃহকেন্দ্রিক, সংযত ও নৈতিকতার ধারক হিসেবে কল্পনা করা হয়।

এই ভদ্রলোক নারী-আদর্শ লোকসংস্কৃতির মুক্ত ও অংশগ্রহণমূলক নারী উপস্থিতিকে সন্দেহের চোখে দেখে। ফলে লোকসংস্কৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ লিঙ্গ রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়ে।

দ্বন্দ্বের ফলাফল:

এই ভাষা, ধর্ম, নৈতিকতা ও শরীরচেতনার দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ লোকসংস্কৃতি ধীরে ধীরে প্রান্তিক অবস্থানে চলে যায়। ভদ্রলোক সংস্কৃতি নিজেকে আধুনিকতার একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এবং লোকসংস্কৃতিকে অতীত, পশ্চাৎপদ ও সংস্কারের যোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করে। এই প্রক্রিয়ায় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সংকুচিত হয় এবং ইতিহাসচর্চা একপাক্ষিক হয়ে ওঠে।

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ: সাংস্কৃতিক আধিপত্য, সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ ও ঔপনিবেশিক আধুনিকতা:

উনিশ শতকের বাংলার লোকসংস্কৃতি ও ভদ্রলোক সংস্কৃতির দ্বন্দ্বকে বোঝার জন্য কেবল ঘটনাভিত্তিক বা বর্ণনামূলক ইতিহাস যথেষ্ট নয়। এই দ্বন্দ্বের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার কাঠামো ও বৌদ্ধিক রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করতে হলে আধুনিক ইতিহাসচর্চার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ধারণা প্রয়োগ করা জরুরি। বিশেষত সাংস্কৃতিক আধিপত্য (Cultural Hegemony), সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ এবং ঔপনিবেশিক আধুনিকতা (Colonial Modernity)— এই তিনটি তাত্ত্বিক কাঠামো উনিশ শতকের বাংলা সমাজের সাংস্কৃতিক রূপান্তর বোঝার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর।

সাংস্কৃতিক আধিপত্য (Cultural Hegemony)

ইতালীয় মার্কসবাদী চিন্তাবিদ আন্তোনিও গ্রামশি সাংস্কৃতিক আধিপত্যের যে ধারণা দেন, তা উনিশ শতকের বাংলার প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। গ্রামশির মতে, শাসক শ্রেণি কেবল বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয়, বরং

সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের মাধ্যমে সমাজে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। বাংলায় ভদ্রলোক শ্রেণি ঠিক এই পথেই তাদের সাংস্কৃতিক ক্ষমতা নির্মাণ করে।

ভদ্রলোক সংস্কৃতি নিজেকে 'আধুনিক', 'যুক্তিবাদী' ও 'শুদ্ধ' হিসেবে উপস্থাপন করে এবং লোকসংস্কৃতিকে 'পশ্চাৎপদ', 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' ও 'অশিক্ষিত' হিসেবে চিহ্নিত করে। এই মূল্যায়ন ধীরে ধীরে সমাজের সাধারণ মানসিক কাঠামোর অংশ হয়ে ওঠে। ফলে লোকসংস্কৃতির অবমূল্যায়ন স্বাভাবিক ও স্বীকৃত সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। এটি ছিল এক ধরনের সাংস্কৃতিক সম্মতি (consent), যা ভদ্রলোক আধিপত্যকে টেকসই করে তোলে।

সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ ও নি:শব্দ ইতিহাস

সাবঅল্টার্ন স্টাডিজের চিন্তাবিদেরা—বিশেষত রণজিৎ গুহ— ঔপনিবেশিক ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চার এলিট-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেন। তাঁদের মতে, ইতিহাসে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা, প্রতিরোধ ও সাংস্কৃতিক চর্চা প্রায়শই উপেক্ষিত থেকে যায়। উনিশ শতকের বাংলার লোকসংস্কৃতি এই 'নিঃশব্দ ইতিহাস'-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

লোকসংস্কৃতির মাধ্যমে গ্রামীণ ও নিম্নবর্গীয় সমাজ তাদের জীবনযাপন, বিশ্বাস ও প্রতিরোধের ভাষা নির্মাণ করেছিল। কিন্তু ভদ্রলোক-নিয়ন্ত্রিত ইতিহাসচর্চা এই অভিজ্ঞতাগুলিকে প্রান্তিক করে তোলে। সাবঅল্টার্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে লোকসংস্কৃতি কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়; বরং এটি ছিল সামাজিক বাস্তবতার এক বিকল্প ভাষ্য।

ঔপনিবেশিক আধুনিকতা ও দ্বৈত চেতনা

ঔপনিবেশিক আধুনিকতার ধারণা আমাদের দেখায় যে আধুনিকতা বাংলায় একটি স্বাভাবিক বা স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া ছিল না। এটি ছিল উপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও ইউরোপীয় জ্ঞানব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এক বিশেষ প্রকল্প। ভদ্রলোক শ্রেণি এই আধুনিকতার মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে।

এই প্রক্রিয়ায় এক ধরনের দ্বৈত চেতনা গড়ে ওঠে। একদিকে ভদ্রলোকরা ঔপনিবেশিক আধুনিকতার ভাষা ও মূল্যবোধ গ্রহণ করেন, অন্যদিকে দেশীয় সংস্কৃতির উপর নৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে লোকসংস্কৃতি একদিকে 'জাতীয় সংস্কৃতি' হিসেবে ব্যবহারযোগ্য, আবার অন্যদিকে 'সংস্কারের যোগ্য' বলে বিবেচিত হয়— এই দ্বৈত অবস্থান লোকসংস্কৃতিকে স্থায়ী অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেয়।

এই তিনটি তাত্ত্বিক কাঠামো ব্যবহার করে বোঝা যায় যে উনিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব কোনো আকস্মিক সংঘর্ষ নয়। এটি ছিল ক্ষমতা, জ্ঞান ও শ্রেণি সম্পর্কের দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল। ভদ্রলোক সংস্কৃতির আধিপত্য ইতিহাসে আধুনিকতার স্বাভাবিক অগ্রগতি হিসেবে উপস্থাপিত হলেও বাস্তবে তা বহু সাংস্কৃতিক কণ্ঠস্বরকে নিঃশব্দ করে দিয়েছে।

উপসংহার:

উনিশ শতকের বাংলায় লোকসংস্কৃতি ও ভদ্রলোক সংস্কৃতির মধ্যকার দ্বন্দ্ব ছিল একটি বহুমাত্রিক সামাজিক প্রক্রিয়া, যা কেবল সাংস্কৃতিক রুচির সংঘর্ষ নয়; বরং ক্ষমতা, শ্রেণি ও জ্ঞানব্যবস্থার পুনর্গঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এই গবেষণায় দেখা গেছে যে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা ভদ্রলোক শ্রেণি আধুনিকতার মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে লোকসংস্কৃতিকে একদিকে জাতীয় পরিচয়ের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছে, আবার অন্যদিকে তাকে পশ্চাৎপদ ও সংস্কারের যোগ্য বলে চিহ্নিত করেছে। লোকসংস্কৃতি—যা গ্রামীণ ও নিম্নবর্গীয় সমাজের অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস ও জীবনচেতনার প্রতিফলন—এই প্রক্রিয়ায় ক্রমশ প্রান্তিক অবস্থানে চলে যায়। ভাষা, ধর্মীয় আচার, নৈতিকতার ধারণা ও শরীরচেতনার প্রশ্নে ভদ্রলোক

সংস্কৃতি নিজের মানদণ্ডকে সার্বজনীন বলে প্রতিষ্ঠা করে। ফলে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সংকুচিত হয় এবং ইতিহাসচর্চা একমুখী ও এলিট-কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে।

এই গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল—লোকসংস্কৃতিকে কেবল ঐতিহ্য বা অতীতের নিদর্শন হিসেবে না দেখে তাকে একটি সক্রিয় সামাজিক ভাষ্য হিসেবে উপস্থাপন করা। সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের তাত্ত্বিক কাঠামোর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে লোকসংস্কৃতি ছিল সামাজিক বাস্তবতার এক বিকল্প পাঠ, যা ভদ্রলোক আধিপত্যের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।

সমকালীন প্রেক্ষাপটে এই দ্বন্দ্বের প্রাসঙ্গিকতা আরও গভীর। আজকের দিনে গণমাধ্যম, শিক্ষাব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক নীতিনির্ধারণে এখনও 'উচ্চ' ও 'নিম্ন' সংস্কৃতির বিভাজন সক্রিয় রয়েছে। লোকসংস্কৃতির পুনর্মূল্যায়ন আমাদেরকে এই বিভাজনের ঐতিহাসিক শিকড় বুঝতে সাহায্য করে এবং সাংস্কৃতিক গণতন্ত্রের ধারণাকে শক্তিশালী করে।

অতএব, উনিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের এই বিশ্লেষণ শুধু অতীত বোঝার একটি প্রয়াস নয়; বরং এটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজে সাংস্কৃতিক ন্যায় ও বহুত্বের প্রশ্নে এক গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধিক হস্তক্ষেপ।

তথ্যসূত্র:

1. Chatterjee, P. (1993). The nation and its fragments: Colonial and postcolonial histories. Princeton University Press.
2. Guha, R. (1982). Elementary aspects of peasant insurgency in colonial India. Oxford University Press.
3. Guha, R. (Ed.). (1988). Subaltern studies VI: Writings on South Asian history and society. Oxford University Press.
4. Chakrabarty, D. (2000). Provincializing Europe: Postcolonial thought and historical difference. Princeton University Press.
5. Bandyopadhyay, S. (2015). From Plassey to Partition and after: A history of modern India. Orient Black Swan.
6. Dirks, N. B. (2001). Castes of mind: Colonialism and the making of modern India. Princeton University Press.
7. Bose, S., & Jalal, A. (2011). Modern South Asia: History, culture, political economy (3rd ed.). Routledge.
8. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। (২০০১)। জাতীয়তাবাদের ইতিহাস: ঔপনিবেশিক ভারত। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।
9. গুহ, রণজিৎ. (১৯৯৬)। ইতিহাসের নিম্নবর্গ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।
10. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর। (২০১১)। পলাশী থেকে দেশভাগ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।
11. সেন, সুকুমার। (২০০৬)। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।
12. মজুমদার, রমেশচন্দ্র। (২০০৮)। বাংলার ইতিহাস। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।
13. দাসগুপ্ত, অশীষ। (২০১০)। ঔপনিবেশিক বাংলা ও সমাজ পরিবর্তন। কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।
14. Gramsci, A. (1971). Selections from the prison notebooks (Q. Hoare & G. Nowell Smith, Eds. & Trans.). International Publishers.
15. Sarkar, S. (2007). Writing social history. Oxford University Press.